সংক্ষিপ্ত নীতিমালা (Policy Brief)

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই সাড়াদান সম্পর্কিত একটি এজেন্ডা

মে ২০২১

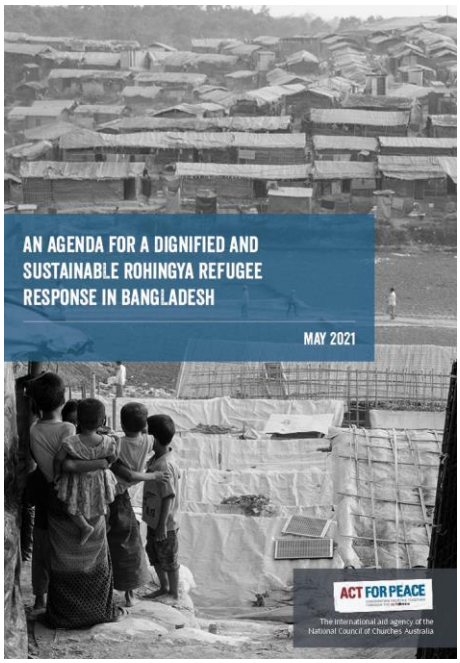

পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি দেখুন:
https://www.actforpeace.org.au/www_AFP/media/act-for-peace/AfP-report-An-Agenda-for-a-Dignified-and-Sustainable-Rohingya-Refugee-Response-in-Bangladesh.pdf

প্রধান ফলাফলসমূহ (Key Findings)

১. ত্রাণ ও উন্নয়নের যোগসূত্রের মাধ্যমে টেকসই পদ্ধতি নিশ্চিত করে যে, ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর অর্থবহ অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং বহুবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশীজন এবং বিষয়বস্তুর পরিপূরক সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সকল অংশীজনদের ধারণ করা মৌলিক মূল্যবোধ হিসেবে সহযোগিতা এবং পরিপূরকতা দ্বারা বিপুল শরণার্থীদের সাড়াদানের জন্য সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতির (whole-of- society approach) প্রয়োগ জটিল।

২. সাময়িক সহায়তা ও দ্রুত প্রত্যাবাসনের আলোকে সরকারের স্বল্পমেয়াদি নীতি কাঠামো থেকে সরে এসে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর নাজুক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে শরাণার্থীদের জন্য একটি শক্তিশালী আইন ও নীতি কাঠামো প্রয়োজন।

৩. বাংলাদেশের বিদ্যমান হাইব্রিড মানবিক সহায়তা সমন্বয় কাঠামো বিকশিত সুরক্ষা এবং প্রায়োগিক বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করে চলছে। সরকার ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ব্যবস্থার মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় নিশ্চিত করা এবং নেতৃত্ব ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করার জন্য রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাড়াদানে কার্যকরি আন্তঃসংস্থা এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতি (whole-of-society approach) একটি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সূচনা বিন্দু।

৪. মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমন্বয় কাঠামোতে শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে প্রাসঙ্গিক সংবেদনশীলতা ও স্থানীয় কাজের ধরনের সূক্ষতর উপলব্ধির মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী সাড়াদানের স্থানীয়করণ (localisation) সম্ভব।

৫. দৈনন্দিন জীবন এবং ভবিষ্যত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে নারী ও তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ অধিকতর উত্তম সুরক্ষা ফলাফল (protection outcomes) দিতে পারে এবং উদ্দেশ্যের সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ (fit-for-purpose) কর্মসূচি এবং নীতি প্রণয়নের পথ তৈরি করতে পারে। এরফলে, কর্মসূচি ও নীতিসমূহ দৃঢ়ভাবে ধারণ করে অধিকতর প্রতিপালনের নিশ্চয়তা তৈরি হয়।

ACT FOR PEACE
CONFRONTING INJUSTICE TOGETHER THROUGH THE actalliance

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সাড়াদানে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতি (Whole of Society Approach)

রোহিঙ্গা শরণার্থী সুরক্ষার বিষয়টি পরিচালিত হয় যারা ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী এবং সেসব নানা ধরনের অংশীজনদের দ্বারা যারা তাদের প্রয়োজনীয়তাসমূহ পূরণে সক্ষম। এই বিবিধ প্রয়োজন মেটাতে নানা ধরনের হস্তক্ষেপ ও কার্যকর দক্ষতার প্রয়োজন হয়। কোনো একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই নিরাপত্তা প্রদান করা অবাস্তব এমনকি সেটি সরকার, ইউএনএইচসিআর'র (UNHCR) মতো বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলেও। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক অংশীজনের (পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, মানবিক সহায়তাকারী ও উন্নয়ন কর্মী, নীতি নির্ধারক, গণমাধ্যম, ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী ইত্যাদি) প্রয়োজন, দুর্বলতা (vulnerabilities) ও ঝুঁকি শনাক্তকরণ এবং সেগুলোর ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে একটি রেফারেল নেটওয়ার্কের আওতায় পরস্পরকে সহযোগিতা করা আবশ্যক।

সর্বসম্মতিক্রমে প্রণীত নিউইয়র্ক ঘোষণা (New York Declaration-NYD) এবং পরবর্তীকালে গৃহীত বৈশ্বিক চুক্তিসমূহে "বহু অংশীজন ও অংশীদারিত্ব পদ্ধতি" এবং "সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতির" (whole-of-society approach) প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। এই সকল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শরণার্থী সুরক্ষায় সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতি সার্বজনীন ঐক্যমত্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশে এই সকল বৈশ্বিক চুক্তি বিশেষ করে সমাজ অন্তর্ভুক্তিকরণ নীতির বাস্তবায়নে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আছে অনেক স্থানীয় দিকও যেমন- দেশীয় ও আঞ্চলিক আইনি ও নীতি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা, অবনতিশীল শরণার্থী সুরক্ষা পরিবেশ, জটিল মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সমন্বয় কাঠামো, শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সমন্বয় কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির সীমিত সুযোগ এবং পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী স্থানীয় নানা এজেন্ডা। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের জন্য ন্যায় ও শান্তির ক্ষীণ সম্ভাবনা এবং বিস্তৃত আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রোহিঙ্গা শরণার্থী সাড়াদান পরিকল্পনার অনুপস্থিতি এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

এই গবেষণাপত্রে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সাড়াদানে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতি কী মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বর্তমান পদ্ধতি শরণার্থী সুরক্ষায় (Refugee Protection) কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, বিদ্যমান সমন্বয় ব্যবস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করে, চলমান স্থানীয়করণ প্রচেষ্টার সাথে মধ্যচ্ছেদ করে এবং অর্থবহ শরণার্থী অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব নিশ্চিত করে তা অধ্যয়ন করা হয়েছে।

শরণার্থী সুরক্ষা এবং সমাধানসমূহ (Refugee Protection and Solutions)

নীতিগতভাবে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তা সাড়াদান পরিচালিত হয় যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনায় (Joint Response Plan- JRP) বর্ণিত সুরক্ষা কাঠামো দ্বারা। 'সুরক্ষা সংকট' (protection crisis) হিসেবে স্বীকৃত এই নীতি কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অথবা আয়ের ক্ষেত্র তৈরির সুযোগের বদলে দ্রুত প্রত্যাবসানের ওপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদি অস্থায়ী সহায়তার ওপর গুরুত্ব দেয়। এর ফলে, শরণার্থীদের অধিকার সংরক্ষণ ও ভালো থাকার নিশ্চয়তা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে।

প্রথম পর্যায় (১৯৭৮)	দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৯১-৯২)	তৃতীয় পর্যায় (২০১৬-১৭)
মিয়ানমারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সামরিক সহিংসতা থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে প্রায় দুই লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী। তাদের বেশিরভাগকে প্রত্যাবাসন করানো হয়, যেখানেজবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগ ছিল , ক্যাম্পের খাদ্য সহায়তা প্রত্যাহারের হুমকি, অপুষ্টি ও ক্ষুধায় ১০ হাজার শরণার্থীর মৃত্যুর খবর ছিল।	২ লাখ ৫০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসে এবং ২০টি ক্যাম্পে তাদের সাময়িকভাবে আশ্রয় দেয়া হয়। তারা *prima facie)* শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং ইউএনএইচসিআর UNHCR কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। ১৯৯৩-১৯৯৭ সময়সীমায়-- জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো হয়েছে - এই অভিযোগসহ ২ লাখ ৩০ হাজারের মতো রোহিঙ্গা শরণার্থী মিয়ানমারে ফেরৎ যায়। ১৯৯২: সরকার নতুন করে রোহিঙ্গা শরণার্থী অনুমোদন বন্ধ করে দেয়। আনুমানিক ৩-৫ লাখ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী নিবন্ধিত ক্যাম্পগুলোর চারপাশে পৌঁছাতে থাকে এবং বসবাস করতে থাকে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দুটি নিবন্ধিত ক্যাম্পে ৩৫ হাজার ৫১৯ জন শরণার্থী ছিল।	আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ২০১২ সাল থেকে মিয়ানমারের রাখাইন (Rakhine) প্রদেশের পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অবনতি হতে থাকে। এখনও পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ বাস্তচ্যুত জনগোষ্ঠীর (IDP) ক্যাম্পগুলোতে এক লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী আটকে আছে। ২০১৬ সালে আরাকান স্যালভেশন আর্মি (আরসা) কর্তৃক সীমান্ত চৌকিতে হামলা চালানোর খবরে সামরিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায় এবং ৮৭ হাজারের মতো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালায়। ২০১৭ সালে রাখাইন প্রদেশে তীব্র সামরিক আক্রমণের মুখে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ৭ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।

** বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন এবং ১৯৬৭ প্রোটোকলের অংশীদার নয়। তবে বাংলাদেশ বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ: আইসিসিপিআর (ICCPR), আইসিইএসসিআর (ICESCR), ক্যাট (CAT), সিআরসি (CRC), সিইআরডি (CERD) এবং সিডিএডব্লিউ (CEDAW)। বাংলাদেশি বিচার বিভাগও ২০১৬ সালের Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) v Government of Bangladesh Writ Petition No 10504 of 2016-এর প্রেক্ষিতে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচলিত রীতি এবং প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে শরণার্থীদের জোরপূর্বক ফেরত না পাঠানোর বাধ্যবাধকতাকে অনুমোদন দিয়েছে (non-refoulement)। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সকল ব্যক্তির জন্য কিছু সাংবিধানিক এবং সাধারণ আইনি বিধান প্রযোজ্য। বাংলাদেশ ২০১৩ সালে, মিয়ানমারের শরণার্থী এবং অনিবন্ধিত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র (National Strategy on Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals) প্রণয়ন করেছে। এই নীতিটি ২০১৬-২০১৭ সালে শরণার্থীদের বৃহৎ সমাগমের পর আর পুনঃমূল্যায়ন করা হয়নি।*

চিত্র ১: বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বিবর্তিত আইনি, নীতি এবং প্রায়োগিক কাঠামো

ক্যাম্পগুলোতে বর্তমান সময়কালের সুরক্ষা পরিবেশ (Current refugee protection environment in the camps)

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা মানবিক সহায়তার ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। তারা ঝুঁকিপূর্ণ নেতিবাচক আচরণ (negative coping mechanisms) অবলম্বন করতে পারে। যেমন: জীবিকার সীমাবদ্ধতার কারণে বেশি বেশি ঋণ করা, সমুদ্র পথে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার (dangerous movements by sea), মানব পাচার (trafficking), শিশুশ্রম (child labour) ইত্যাদি।

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর সুরক্ষা পরিস্থিতি

নিরাপত্তাহীনতা:

- শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা: ক্রমবর্ধমান রোহিঙ্গা বিরোধী মনোভাব ও বিদেশি-ভীতি (xenophobia)।
- অপরাধমূলক কাজ বৃদ্ধি: অপহরণ, চাঁদাবাজি, বিচার বহির্ভূত হত্যা (extra-judicial killings), মাদক এবং মানবপাচার।
- প্রতিদ্বন্দ্বী রোহিঙ্গা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সহিংস সংঘাত যা দায়মুক্তি (impunity) এবং ক্যাম্পের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার মধ্যে পরিচালিত হয়।

লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা:

- লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার তীব্র ব্যাপকতা ও কম রিপোর্টিং । এটি নারী ও বালিকাদের সেবা ও সুযোগের অভিগম্যতা সীমিত করে। যেমন- ধোওয়া-কাচার/ প্রক্ষালন সুবিধা, পানি সংগ্রহের স্থান ও ক্যাম্পের আশেপাশে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করার স্বাধীনতা।
- কোভিড-১৯ মহামারি নারীদের লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি বাড়িয়েছে কিন্তু পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ সীমিত করেছে।
- রোহিঙ্গা নারী স্বেচ্ছাসেবীরা অপবাদ ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে।

ন্যায়বিচারের সীমিত উপলব্ধি:

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা শাসিত হয় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা, যা বিভিন্ন প্রশাসনিক ও বিবেচনামূলক বিধিবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

শরণার্থী প্রত্যাবাসন কেন্দ্রিক নীতির প্রভাব:

- তাৎক্ষণিক নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের সম্ভাবনা ক্ষীণ
- ক্রমবর্ধমান ত্রাণ নির্ভরতা এবং দুর্বল সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা (community resilience)
- ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতা ভয় এবং হতাশা তৈরি করছে
- ব্যাহত বিচ্ছিন্নতা এবং রোহিঙ্গা বিদ্বেষী মনোভাব স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সামাজিক উত্তেজনা (social tensions) বৃদ্ধি করেছে।

মানবিক সহায়তার ক্ষেত্র ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা:

- এনজিও কার্যক্রম স্থগিত
- মানবিক সংস্থা ও স্টাফের বিরুদ্ধে তদন্ত
- মানবিক সহায়তা প্রকল্পে আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা
- স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব

কোভিড-১৯'র আনুষঙ্গিক সুরক্ষা প্রভাব:

- শরণার্থী শিবিরে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে মানবতাসূচক কর্মকান্ড হ্রাস করা হয়।
- এই সময়ে সুরক্ষা, স্থান-ব্যবস্থাপনা, আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত, জীবিকা ও শিক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা কমানো হয়। এইসব পরিষেবাগুলি অ-প্রয়োজনীয় হিসাবে গণ্য হয়েছিল।
- সুরক্ষা ঝুঁকি বেড়ে গেছে, কমিউনিটি নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়েছে, অর্থনৈতিক দুর্বলতা বেড়েছে এবং শরণার্থী ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে আস্থা হ্রাস পেয়েছে।

আগস্ট ২০১৯: সুরক্ষাকরণের দিকে জটিল মোড়

২০১৯ এর আগস্ট থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি নীতি ও জনমতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ কিছু ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ নেয় যা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মৌলিক অধিকারের সুযোগকে প্রভাবিত করে এবং মানবিক সহায়তা সীমিত করে। কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছিল, যেমন দ্বিতীয়বার প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া, একদল রোহিঙ্গা কর্তৃক বাংলাদেশের যুবনেতাকে হত্যার অভিযোগ এবং সর্বশেষ মিয়ানমার থেকে প্রস্থানের দ্বিতীয়বার্ষিকীতে রোহিঙ্গাদের বিশাল সমাবেশ। রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সুরক্ষা এবং মিয়ানমারে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনকে অগ্রাধিকার দেয়ার নীতি নিয়েছে।

চিত্র ৩: বিবর্তিত সুরক্ষা পরিবেশ (২০১৯-২০২১)

যৌথ শরণার্থী সুরক্ষা অধিপরামর্শের প্রয়োজনীয়তা (Need for joint refugee protection advocacy)

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনকে কেন্দ্র করে সরকারের স্বল্পমেয়াদি কৌশল যৌথ এনজিও প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মানবিক সংস্থাগুলি মিয়ানমার ও এশিয়া অঞ্চলে তাদের সহযোগীদের সাথে যৌথ অধিপরামর্শের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মানবাধিকার সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবিক প্ল্যাটফর্ম কক্সবাজার ভিত্তিক এজেন্সি এবং নেটওয়ার্কগুলির কাজকে সমর্থন করেছে।

মানবিক সংস্থাগুলিকে অবশ্যই এমন একটি জায়গা অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে যেখানে তারা মানবিক নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারের জবাবদিহিতা চাইতে পারে এবং সরকারের সাথে সহযোগী কাজের সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। যদিও এটি কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। জনসমর্থনমূলক প্রচেষ্টার সাথে শান্তিপূর্ণ কূটনীতির ভারসাম্য রক্ষা করে একটি সম্মিলিত কৌশলের মাধ্যমে এটি অর্জন করা যেতে পারে।

শরণার্থী সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

বাংলাদেশ সরকারের উচিত:

১. নীতিকাঠামো পর্যালোচনা করা: মিয়ানমারের শরণার্থী এবং অনিবন্ধিত মিয়ানমার নাগরিক বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৩'র পর্যালোচনার একটি জরুরি উদ্যোগ নেয়া।

২. ক্যাম্পের নিরাপত্তা উন্নত করা: ক্যাম্পের নিরাপত্তা উন্নত ও সহায়তাকারী অংশীজনদের সাথে আলাপচারিতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীগত সহনশীলতা (community resilience) তৈরিতে কাজ করা।

৩. মানবিক সহায়তার অভিগমন উন্নত করা: একটি দক্ষ, কার্যকর এবং প্রত্যাশিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা (১ বছর, এফডি-৭ অনুমোদনসহ) নিশ্চিত করা; আস্থা, বোঝাপড়া এবং কার্যকর সহযোগিতা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে নিয়মিত সংলাপ, এবং অবাধ মানবিক সহায়তা অভিগমন নিশ্চিত করা।

৪. মিয়ানমারে জবাবদিহিতা সমর্থন করা: মিয়ানমারে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী, দাতা এবং মানবিক সহায়তাকারী গোষ্ঠীর উচিত:
(সকল আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং আঞ্চলিক অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে)

৫. অধিপরামর্শ সহায়তা: ঐক্যমত্য তৈরিতে অগ্রাধিকার দেয়া, শরণার্থী সুরক্ষাকে জোরদার করার লক্ষ্যে অধিপরামর্শের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র কিন্তু সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা।

৬. মানবিক অভিগম্যতারর (humanitarian access) চ্যালেঞ্জসমূহ অনুসরণ ও সমাধান: অভিগম্যতার সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ এবং কৌশলগত সমাধান প্রস্তাবের একটি নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আইএসসিজি (ISCG)-র নেতৃত্বে একটি *হিউম্যানেটেরিয়ান অ্যাক্সেস ওয়ার্কিং গ্রুপ* প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা।

৭. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা করার জন্য দায়বদ্ধতা ভাগ করে নেওয়া এবং তাদের জন্য আরও ভালো সুরক্ষা ফলাফল (সম্ভাব্য সমাধানসহ) পাওয়ার নিমিত্তে অবহিত করতে ও জোরদার প্রচেষ্টা চালাতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে সংযুক্ত হওয়া।

৮. সাড়াদানের একটি স্বাধীন মূল্যায়নে বিনিয়োগ করা রোহিঙ্গা শরণার্থী সাড়াদানে একটি স্বাধীন এবং পরামর্শমূলক মূল্যায়নে Strategic Executive Group and Inter-Sector Coordination Group মাধ্যমে) বিনিয়োগ করা যেটি সাড়াদান প্রক্রিয়া কী মাত্রায় সুরক্ষা এবং সহায়তার প্রয়োজনীয়তাসমূহ পূরণ করতে সক্ষম তার মূল্যায়ন করবে, অর্জিত শিক্ষাসমূহ তুলে ধরবে, ভাল কর্ম পদ্ধতিকে চিহ্নিত করবে এবং অংশীজনদের মধ্যে দৃঢ় পরিপূরক সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে কৌশলগত ও প্রায়োগিক সুপারিশ প্রস্তাব করবে।

মানবিক সহায়তা সমন্বয় (Humanitarian Coordination)

রোহিঙ্গা শরণার্থী সাড়াদান সমন্বয় একটি জটিল বিষয় যা আন্তঃসংস্থা গতিশীলতা এবং বাংলাদেশের শাসনপদ্ধতির পরিবেশ প্রতিফলিত করে। এই ধরনের সমন্বয় জাতীয় পর্যায়ে, কক্সবাজারে এবং ক্যাম্প এলাকা পর্যায় - এই তিনটি স্তরে বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ (United Nations) , এনজিও, দাতাগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মতো অংশীজনদের সাথে কাজ করে।

	জাতীয় স্তর	কক্সবাজার স্তর	ক্যাম্প স্তর
সরকার	- জাতীয় কমিটি (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-MoHA এর অধীনে) - জাতীয় টাস্ক ফোর্স (National Task Force-NTF) - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MODMR) - এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (NGOB)	- শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় (RRRC) - জেলা/উপজেলা প্রশাসন - পুলিশ - সেনাবাহিনী	- ক্যাম্প ইনচার্জ (সিআইসি) (এসিআইসি) - আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন - বাংলাদেশি সেনা
জাতিসংঘ	- স্ট্রাটেটেজিক এক্সিকিউটিভ গ্রুপ (SEG) - লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্স (LTF) - প্রোটেকশন অ্যাডভোকেসি ওয়ার্কিং গ্রুপ (PAWG)	- ইন্টার সেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ (ISCG) - হেডস অফ সাব অফিস গ্রুপ (এইচওএসওজি) - সেক্টরস	- সাইট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সাইট ডেভেলপমেন্ট সেক্টরস (এসএমএসডি) - আইএসসিজি/সেক্টরস
দাতা গোষ্ঠী	- SEG'র সদস্যবৃন্দ (LTF এবং PAWG 'সহ) - সরকারি কর্তৃপক্ষ, জাতিসংঘ ও এনজিওগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পৃক্ততা	- এইচওএসওজি'র সদস্যবৃন্দ, সেক্টর সমন্বয় মিটিংয়ে অংশগ্রহণ - আরআরআরসি, জেলা প্রশাসন, জাতিসংঘ এবং এনজিওগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পৃক্ততা	---
এনজিও	- প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক আইএনজিও/ বাংলাদেশের এনজিও নেটওয়ার্কসমূহ - দুর্যোগ প্রস্তুতি (NAHAB; NIRAPAD; BDPC; ADAB; FNB) - রোহিঙ্গা সাড়াদান (INGO Forum & INGO ESC; CSO Alliance)	- এনজিও নেটওয়ার্কসমূহ: - বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সাড়াদান এনজিও প্ল্যাটফর্ম (এনজিও প্ল্যাটফর্ম) - কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরাম (সিসিএনএফ) - সেক্টর নেতৃবৃন্দ/সদস্যবৃন্দ	- ক্যাম্প পর্যায়ে সেক্টর ফোকাল পয়েন্ট - পরিষেবা সরবরাহ
শরণার্থী	---	---	- ক্যাম্পের মাঝি এবং কিছু ক্যাম্পের ব্লক ভিত্তিক কমিটি - পাড়া উন্নয়ন কমিটি (শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী) - অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠীভিত্তিক নেটওয়ার্ক - ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ

চিত্র ৪: রোহিঙ্গা সমন্বয় কাঠামোর স্তর/কর্মী

সমন্বয় মডেলের কার্যকারিতা

মানবিক সহায়তা সমন্বয়ের কার্যকারিতা বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যেমন- বাংলাদেশের আইনি ও সুরক্ষা নীতি পরিবেশ, সরকার, মানবিক সহায়তাকারী গোষ্ঠী এবং শরণার্থীদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক এবং মানবিক সহায়তা অংশীদারদের মধ্যকার সম্পর্ক/সহযোগিতা।

সরকারি সমন্বয় কাঠামোগুলি কখনও কখনও জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন সমন্বয় কাঠামোগুলোর সমান্তরালে কাজ করে থাকে এবং মানবিক সহায়তা কর্মীদের সাথে যুক্ত হয়ে জেআরপি (JRP) এবং মানবিক সহায়তা সমন্বয় ফোরামের বাইরেও সাড়াদান সম্পর্কিত তাৎক্ষণিক (ad-hoc) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কারণে জবাবদিহির সীমারেখাগুলো অস্পষ্ট থেকে যায় এবং কোনও একক সত্তা সম্ভাব্য কোনও ব্যর্থতার জন্য পুরোপুরি দায়বদ্ধ হয় না।

সমন্বয় ব্যবস্থায় এনজিওগুলির অভিগমন এবং অন্তর্ভুক্তি নির্ভর করে তাদের আকার, কার্যক্রমের মূল ক্ষেত্র, তহবিল, অংশীদারিত্ব ইত্যাদির উপর। এনজিওগুলোর বিশেষত বাংলাদেশি এনজিওগুলির প্রতিনিধিত্ব, সহ-নেতৃত্ব সেক্টরগুলোতে এবং স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইজরি গ্রুপের (SEG) সদস্য হিসাবে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ভাষার বাধা, জটিল নথি এবং ভাষার ব্যবহার স্থানীয় এনজিও অংশীদারদের এই ভূমিকাগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পথে মূল বাধা তৈরি করে।

বর্তমানে ঢাকা ও কক্সবাজারে বেশকিছু এনজিও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ সক্রিয় যা ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করছে। এই বিবিধ প্রক্রিয়াগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে সমন্বয় সাধন এবং সর্বসম্মতি তৈরিতে সবসময় একে অপরের সাথে সহযোগিতা করতে এবং পরিপূরক হয়ে উঠতে পারছে না। কঠিন কর্ম পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশি এনজিওগুলোর মধ্যে জটিল সম্পর্ক এনজিওর সহযোগিতার সুযোগকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। মানবিক সমন্বয় ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ফোরামে শরণার্থীদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের অভাব আস্থার সংকট এবং কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে এবং ক্যাম্পগুলোতে উত্তেজনা ও অস্থিতিশীলতা বাড়াচ্ছে।

মানবিক সহায়তা সমন্বয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

৯. বিদ্যমান সমন্বয় কাঠামো পর্যালোচনা করা: SEG এবং ISCG-র উচিত সমস্ত বিদ্যমান নেটওয়ার্ক এবং সমন্বয় কাঠামোকে বিবেচনা করা। মানবিক সংস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্তি এবং বর্জন (inclusion and exclusion) সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ করা উচিত। পাশাপাশি, ক্রিয়াশীলদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা স্পষ্টতার অভাব (conflict or lack of clarity) চিহ্নিত করা এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামত অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

১০. তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা: মানবিক সহায়তাকারী গোষ্ঠীর উচিত তাদের সরকারী অংশীদার এবং মানবিক সহায়তা কর্মী উভয়ের জন্য তথ্য বিনিময়ের একটি সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মানদণ্ড প্রবর্তন করা।

১১. একটি রেফারেল গাইড একীভূত করা: সমস্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের উচিত রোহিঙ্গা শরণার্থী সাড়াদানের পরিপূরক ভূমিকা ও সক্ষমতা সম্পর্কে সর্ ঐকমত্য প্রসারিত করতে এবং বিভিন্ন মানবিক সহায়তা অংশীজনদের মধ্যে আস্থা তৈরিতে একটি অংশগ্রহণমূলক "রেফারেল গাইড" একীকরণের বিষয়টি বিবেচনা করা।

স্থানীয়করণ: *এটি একটি প্রক্রিয়া যা নিশ্চিত করে সংকটে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর সবচেয়ে নিকটে থাকাদের মানবিক সহায়তা প্রস্তুতি এবং সাড়াদান সক্ষমতা থাকবে যেহেতু তারাই দ্রুত এবং যথাযথভাবে সাড়াদানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থানে আছে এবং দীর্ঘসময় ধরে সেখানে থাকে।* [1]

স্থানীয়' সংজ্ঞাটি সমজাতিক নয় বরং তর্কসাপেক্ষ এবং অস্পষ্ট।

পরিপূরকতা (Complementarity): *এমন একটি ফলাফল যেখানে আঞ্চলিক, জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক - সমস্ত স্তরের সমস্ত সক্ষমতা এমনভাবে সংযুক্ত এবং একত্রিত হয় যেন তা ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের জন্য সর্বোত্তম মানবিক সহায়তা ফল আনতে সহায়তা করতে পারে।* [2]

কর্মী বা স্থান কেন্দ্রিক স্থানীয়করণ (Actor or location-centred localisation): স্থানীয় কে? স্থানীয় কোথায়?

- আন্তর্জাতিক বনাম স্থানীয়
- জাতীয় বনাম স্থানীয়
- INGO/NNGO/LNGO
- ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলো কি (affected communities)? স্থানীয় কে?
- কমীবৃন্দ বা স্থানসমূহের মধ্যে কোথায় সীমারেখা টানতে হবে...?
- কে অন্তর্ভুক্ত? কে বর্জিত?

ইস্যুকেন্দ্রিক স্থানীয়করণ (Issue-centred localisation):

- **সহায়তা স্থানীয়করণ (Aid localisation):** প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি এবং ঝুঁকি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দাতারা জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক এনজিও'র মাধ্যমে তহবিল পরিচালিত করে। দাতা এবং উপ-চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কের মাধ্যমে ক্ষমতার গতিশীলতা টিকে থাকে।
- **স্থানীয় সক্ষমতা (Local capacity):** প্রায়োগিক সক্ষমতা (technical capacity) বনাম বৈধতা (legitimacy)। যেখানে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মাঝে প্রায়োগিকদক্ষতা, আর্থিক পুঁজি এবং বৃহৎ আমলাতান্ত্রিক আবশ্যিক শর্ত সামাল দেয়ার সক্ষমতা দেখা যায়, স্থানীয় এবং জাতীয় কর্মীদের মাঝে প্রেক্ষাপট এবং সংস্কৃতি, স্থানীয় গোষ্ঠীর প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞান এবং জাতীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষে নেতৃত্ব কাঠামো সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং সেগুলো সঠিক পথে পরিচালনার সক্ষমতা দেখা যায়।

চিত্র ৫ : স্থানীয়করণের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

[1] K. Van Brabant & S. Patel, Seven Dimensions of Localisation-Emerging Indicators and Practical Recommendations, Global Mentoring Initiative (GMI), p.3, available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Localisation-In-Practice-Full-Report-v4.pdf

[2] Veronique Barbelet, Rethinking capacity and complementarity for a more local humanitarian action, HPG, October 2019, p.5, available at http://www.w.cib-uclg.org/sites/default/files/odi_-_rethinking_capacity_and_complementarity_for_a_more_local_humanitarian_action_0.pdf

মানবিক কার্যকলাপের পরিপূরকতা (Complementarity of humanitarian action)

প্রতিযোগিতামূলক ভূমিতে 'জাতীয় / স্থানীয় বনাম আন্তর্জাতিক কর্তাদের কেন্দ্রবিন্দু করে স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না যেহেতু অনেক মানবিক সহায়তাকর্মী স্বল্প সংখ্যক উৎস থেকে অর্থ সহায়তা পাওয়ার চেষ্টা করছে। একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হ'ল এনজিওগুলির বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করা এবং সহযোগীদের মধ্যে সমতা ও অংশীদার ভিত্তিক পদ্ধতিকে সমর্থন করা।

মানবিক সংস্থাগুলোর মধ্যে আস্থার অভাব সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতিকে (whole-of-society approach) বাধাগ্রস্ত করে। এটি এনজিওগুলোর মধ্যে যোগাযোগকে ব্যাহত করতে পারে এবং স্থানীয়করণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদের প্রতিদিনের জীবন এবং মিয়ানমারে ভবিষ্যৎ প্রত্যাবাসনকে প্রভাবিত করে এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

স্থানীয়করণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

১২. দাতা গোষ্ঠীর নীতি পুনর্বিবেচনা/সংশোধন করা: দাতাগোষ্ঠীর উচিত 'গ্র্যান্ড বার্গেইন' প্রতিশ্রুতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছোট জাতীয় সংস্থা এবং শরণার্থী নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলো যেন অর্থ সহায়তা পায় সেটি নিশ্চিত করা। পাশাপাশি, জটিল এবং অসম ক্ষমতা কাঠামোর কারণে মানবিক সম্প্রদায়ের বিভাজনের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং মানবিক কার্যক্রমে পরিপূরকতা বাড়ানোর জন্য তাদের শক্তি এবং প্রভাব ব্যবহার করতে হবে।

১৩. একটি অংশগ্রহণমূলক স্থানীয়করণ কৌশল (shared localisation strategy) প্রণয়ন: SEG এবং ISCG-র উচিত বিকশিত এবং জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সম্পৃক্ততা এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে সংহতি অর্জন এবং ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ফলাফলসমূহকে উন্নত করার লক্ষ্যে একটি অংশগ্রহণমূলক স্থানীয়করণ কৌশল প্রণয়নে নেতৃত্ব দেওয়া।

১৪. সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতির (Whole of society approach)জন্য যৌথ প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করা: এনজিও গোষ্ঠীগুলোর (সমস্ত আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় সংস্থা সহ) উচিত ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম মানবিক সহায়তা ফলাফল অর্জনে পরিপূরক এবং সমন্বিত এনজিও কার্যক্রমে (complementary and coordinated NGO action) অগ্রাধিকার দেওয়া।

ক্রস কাটিং ইস্যু: ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ (Engagement of affected communities)

২০১৭-২০১৮ সালে, রোহিঙ্গা সুশীল সমাজ সংস্থা (CSOs) কক্সবাজার শিবিরের মধ্যে ভাল কাজ করছিল। মহিলা এবং যুবসমাজসহ এই দলগুলি তাদের অধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করেছিল। আগস্ট ২০১৯ ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ এই প্রচেষ্টাগুলির ক্ষেত্র সংকুচিত করে।

রোহিঙ্গা সংগঠনগুলো (সিএসও) নিবন্ধন (registration) করতে পারে না কিংবা সরাসরি তহবিল গ্রহণ এবং সহায়তা বিতরণ (aid distribution) করতে পারে না। মানবিক সংস্থাগুলো তাদের সাথে নানা শলাপরামর্শ করে কিন্তু কীভাবে তাদের প্রতিক্রিয়াগুলো মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে তথ্যবহুল করছে কিংবা সংশোধিত করছে সে বিষয়ে তাদের অবহিত করা হয় না। মানবিক সহায়তার অংশীজনদের নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ফোরামেও তারা অংশগ্রহণ করতে পারে না।

পাশাপাশি, হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী যারা সংকটপূর্ণ পরিষেবা প্রদানে এবং জীবনরক্ষার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে ক্যাম্পগুলোতে স্বেচ্ছাসেবী এবং ফ্রন্টলাইনকর্মীর কাজ করছে, তারা বৈধ মানবিক সহায়তাকর্মী হিসাবে স্বীকৃত নয় এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে বৃহত্তর প্রায়োগিক অগ্রাধিকারে তাদের মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত। ২০১৯ সাল থেকে ক্যাম্পগুলোতে স্বেচ্ছাসেবী এবং নগদ-ভিত্তিক কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শরণার্থীদের অংশগ্রহণের অভাব মানবিক সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের আস্থা হ্রাস করবে। এটি কর্মসূচি বাস্তবায়নকে কঠিন করে তুলবে এবং শিবিরগুলোতে নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশা বাড়িয়ে তুলবে।

ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

বাংলাদেশ সরকার এবং মানবিক সহায়তাকারী গোষ্ঠীগুলোর উচিত:

১৫. রোহিঙ্গা প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা: গোষ্ঠীর নিজ-প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্বের (community self-representation and leadership) মাধ্যমে মানবিক সহায়তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্ব কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত।

১৬. সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করা: স্থানীয় সম্প্রদায় এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করা উচিত। এটি আস্থা তৈরি করতে, সার্বজনীন সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং বিবাদ সমাধানে সহায়তা করবে।

Contact Us

Act for Peace

Address: Locked Bag Q199, QUEEN VICTORIA BUILDING NSW 1230

Tel: 1800 025 101

Email: info@actforpeace.org.au

Website: www.actforpeace.org.au

ABN: 86 619 970 188

ACT FOR PEACE
CONFRONTING INJUSTICE TOGETHER
THROUGH THE actalliance